بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ মোতাবেক ০৮ ফাতাহ্, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবায় উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সংক্ষেপে যা বর্ণনা করেছেন (এখন) সেটি তুলে ধরছি। তিনি (রা.) বলেন,

কাফের সৈন্যরা বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার সময় এই ঘোষণা করে যে, আগামী বছর আমরা পুনরায় মদীনায় আক্রমণ করব আর মুসলমানদের কাছ থেকে নিজেদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেব। অতএব এক বছর পর তারা পুনরায় পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মদীনায় আক্রমণ করে। মক্কাবাসীদের ক্রোধের চিত্র এই ছিল যে, বদরের যুদ্ধের পর তারা ঘোষণা করেছিল, মৃত স্বজনদের জন্য কেউ কাঁদতে পারবে না। যে বাণিজ্যিক কাফেলা আসবে এর উপার্জিত লভ্যাংশ আগামী যুদ্ধের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। অতএব বেশ প্রস্তুতির পর তিন হাজারের অধিক সৈন্যের একটি বাহিনী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদীনায় হামলা করে। মহানবী (সা.) সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন যে, আমাদের কি শহরের ভেতরে অবস্থান করে মোকাবিলা করা উচিত নাকি বাহিরে গিয়ে। তাঁর (সা.) নিজের মত এটিই ছিল যে, শত্রুকে আক্রমণ করতে দেয়া উচিত যেন যুদ্ধ আরম্ভ করার জন্যও তারাই দায়ী থাকে আর মুসলমানরা ঘরে থেকে সহজেই এর মোকাবিলা করতে পারে। কিন্ত সেসব যুবক শ্রেণির মুসলমান যারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় নি আর যাদের হৃদয়ে আক্ষেপ ছিল যে, 'হায়, আমরাও যদি খোদার পথে শহীদ হওয়ার সুযোগ পেতাম!' তারা জোর দিয়ে বলে যে, আমাদেরকে শাহাদাত থেকে কেন বঞ্চিত রাখা হচ্ছে? অতএব তিনি (সা.) তাদের কথা মেনে নেন। পরামর্শ গ্রহণের সময় তিনি (সা.) নিজের একটি স্বপ্নও শোনান। তিনি (সা.) বলেন, স্বপ্নে আমি কয়েকটি গাভী দেখেছি। আর আমি দেখেছি যে, আমার তরবারির প্রান্ত ভেঙে গেছে। আর আমি এ-ও দেখেছি যে, সেসব গাভী জবাই করা হচ্ছে। এরপর দেখি, আমি আমার হাত একটি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত বর্মের ভেতরে ঢুকিয়েছি। আর আমি আরও দেখেছি যে, আমি একটি ভেড়ার পিঠে আরোহিত আছি। সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এসব স্বপ্নের কী অর্থ করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, গাভীর জবাই হওয়ার ব্যাখ্যা হলো, আমার কতিপয় সাহাবী শহীদ হবেন। আর তরবারির ফলা ভেঙে যাওয়ার অর্থ হলো, আমার প্রিয়দের মাঝ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তি শহীদ হবেন অথবা হয়ত আমারই এই অভিযানে কোনো ক্ষতি হবে। আর বর্মে হাত ঢুকানোর ব্যাখ্যা আমি এটি মনে করি যে, আমাদের মদীনায় অবস্থান করা অধিক সমীচীন হবে। আর ভেড়ায় আরোহণের ব্যাখ্যা সম্ভবত এটি হবে যে, কাফেরদের সেনাপতির ওপর আমরা বিজয়ী হব অর্থাৎ তাকে আমরা পরাজিত করব। অর্থাৎ সে মুসলমানদের হাতে নিহত হবে। যদিও এই স্বপ্নে মুসলমানদের কাছে এটি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছিল যে, তাদের মদীনায় অবস্থান করাই উত্তম, কিন্তু যেহেতু স্বপ্নের ব্যাখ্যা মহানবী (সা.)-এর নিজের ছিল, এলহাম ভিত্তিক ছিল না–

তাই তিনি (সা.) সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে গ্রহণ করেন আর লড়াইয়ের জন্য বাহিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

স্বপ্নে বিভিন্ন ইঙ্গিত থেকে থাকে– একথার বরাত টেনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন রূপক বিষয়ের উল্লেখ করে বলেন,

রূপক বিষয়াদি যা মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন দিব্যদর্শন ও স্বপ্নে বিদ্যমান, সেগুলো হাদীস পাঠকারীদের কাছে সুপ্ত ও গোপন নয়। কখনো দিব্যদর্শনে মহানবী (সা.) নিজের উভয় হাতে দুটি স্বর্ণের কঙ্কণ পরিহিত দেখেছেন আর এর অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে দুজন মিথ্যাবাদী যারা নবী হওয়ার মিথ্যা দাবি করেছিল। আর কখনো মহানবী (সা.) তাঁর সত্যস্বপ্ন ও দিব্যদর্শনে কিছু গাভী জবাই হতে দেখেছেন। এর অর্থ ছিল সেসব সাহাবী যারা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। অনুরূপ বহু দৃষ্টান্ত অন্য নবীদের বিভিন্ন দিব্যদর্শনেও দেখা যায়। অর্থাৎ বাহ্যত তাদের কাছে কিছু দেখানো হয়েছে আর আসলে তার অর্থ ছিল ভিন্ন। তাই নবীদের কথায় রূপক ও আলঙ্কারিকতার উপস্থিতি বিরল কোনো বিষয় নয়।

যাহোক যখন বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। আর তিনি নিজেও যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা এরূপ যে, যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর কাছে স্বপ্নের কারণে শহরের বাহিরে গিয়ে লড়াই করা পছন্দ ছিল না। কিন্তু লোকেরা যখন অনবরত জোর দিতে থাকে তখন তিনি (সা.) তাদের সাথে সহমত হন। তিনি জুমুআর নামায পড়ান আর মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। আর তাদেরকে নির্দেশ দেন যেন তারা পুরো মনপ্রাণ দিয়ে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে। তিনি (সা.) তাদেরকে সুসংবাদ দেন যে, মানুষ যদি ধৈর্য ধারণ করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিজয় ও সফলতা দান করবেন। এরপর তিনি মানুষকে নির্দেশ দেন যেন তারা গিয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মানুষ এই নির্দেশ শুনে আনন্দিত হয়। এরপর তিনি (সা.) সবার সাথে আসরের নামায পড়েন। ততক্ষণে তারাও একত্রিত হয়ে যায় যারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো থেকে এসেছিল। এরপর মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের সাথে নিজের ঘরে যান। তারা উভয়ে মহানবী (সা.)-এর পাগড়ি বাঁধেন আর তাঁকে যুদ্ধের পোশাক পরিয়ে দেন। এরপর মানুষ তাঁর অপেক্ষায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন হযরত সা'দ বিন মুআয এবং হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের মানুষকে বলেন, তোমরা বাহিরে গিয়ে লড়াই করার জন্য মহানবী (সা.)-কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করেছ। তাই এখনও এই বিষয়টিকে তাঁর (সা.) হাতে ছেড়ে দাও। তিনি (সা.) যে নির্দেশই দেবেন আর তাঁর মত যা হবে– তোমাদের জন্য তাতেই মঙ্গল নিহিত থাকবে। তাই তাঁর (সা.) আনুগত্য করো। মহানবী (সা.) যখন বাহিরে আসেন তখন তিনি যুদ্ধের পোশাক পরিহিত ছিলেন। তিনি দুটো বর্ম পরিহিত ছিলেন, অর্থাৎ একটির ওপর আরেকটি বর্ম ছিল। এগুলো ছিল 'যাতুল ফুযূল' এবং 'ফিযা' নামক বর্ম। আর 'যাতুল ফুযূল' ছিল সেই বর্ম যা হযরত সা'দ বিন উবাদা তাঁকে তখন প্রেরণ করেছিলেন যখন তিনি (সা.) বদরের যুদ্ধের জন্য যাচ্ছিলেন। আর এটিই ছিল সেই বর্ম যা তাঁর মৃত্যুর সময় এক ইহুদীর কাছে বন্ধক রাখা ছিল। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) উক্ত বর্মটি ছাড়িয়ে এনেছিলেন। অর্থাৎ তাকে অর্থ দিয়ে সেটি ফিরিয়ে আনেন। মহানবী (সা.) তাঁর পার্শ্বদেশে তরবারি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন আর পেছনে তূণ লাগিয়ে রেখেছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে অনুসারে তিনি 'সাকাব' নামক নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করেন, ধনুক ঝুলান আর বর্শা হাতে নেন। যাহোক, হতে পারে এই উভয় ঘটনা ঘটেছে, ভিন্ন ভিন্ন মানুষ তা দেখেছে। মহানবী (সা.) যখন নিজের ঘর থেকে

বাহিরে আসেন তখন তিনি অস্ত্রসজ্জিত ছিলেন। তখন তাঁকে এই সংবাদ প্রদান করা হয় যে, মালেক বিন আমর নাজ্জারী মৃত্যু বরণ করেছেন আর তার মৃতদেহ জানাযার স্থানে রাখা হয়েছে। তিনি (সা.) যাওয়ার পূর্বে তার জানাযা পড়ান। লোকেরা তাঁর সমীপে তখন নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার মতামতের বিরোধিতা করা বা আপনাকে বাধ্য করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই আপনি যা যুক্তিযুক্ত বা সঠিক মনে করেন সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিন। এক রেওয়ায়েতে এটিও আছে যে, আপনি যদি শহরের বাইরে গিয়ে মোকাবিলা করা পছন্দ না করেন তাহলে (আমরা) এখানেই অবস্থান করি। তিনি (সা.) বলেন, 'নবীর জন্য এটি বৈধ নয় যে, তিনি অস্ত্র ধারণের পর সেই সময় পর্যন্ত তা নামিয়ে রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এবং তাঁর শত্রুদের মাঝে মীমাংসা করে না দেন'। আরেক রেওয়ায়েতে এর পরিবর্তে এই বাক্য রয়েছে যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত সে যুদ্ধ না করে'। মহানবী (সা.)-এর প্রস্তুতি এবং সাহাবীদের ভুলের অনুশোচনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন যে,

তিনি (সা.) গৃহাভ্যন্তরে যান আর সেখানে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)'র সাহায্যে তিনি পাগড়ি বাঁধেন এবং (যুদ্ধের) পোশাক পরিধান করেন। এরপর যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বাইরে আসেন। কিন্তু ইতঃমধ্যে কতক সাহাবীর বুঝানোর ফলে যুবকরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন যে, মহানবী (সা.)-এর মতের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের মতের ওপর জোর দেওয়া উচিত হয় নি। তাদের যখন এই বোধোদয় ঘটে তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশ অনুতপ্ত হয়ে পড়ে। তারা যখন মহানবী (সা.)-কে সশস্ত্র হয়ে এবং দুটি বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি পরিহিত অবস্থায় আসতে দেখেন তখন তাদের অনুশোচনা আরো বেড়ে যায়। আরা তারা সবাই একবাক্যে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের ভুল হয়ে গেছে, আমরা আপনার মতের বিরুদ্ধে নিজেদের মতামতের ওপর জোর দিয়েছি। আপনি যেভাবে ভালো মনে করেন সেভাবেই পদক্ষেপ নিন। ইনশাআল্লাহ্, এতেই কল্যাণ হবে। তিনি (সা.) বলেন, 'এটি খোদার নবীর মর্যাদা পরিপন্থি যে, তিনি অস্ত্র ধারণ করার পর তা আবার খুলে রাখবেন, (তবে) খোদা কোনো সিদ্ধান্ত দিলে সেটি ভিন্ন কথা। অতএব, এখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এগিয়ে চলো, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো যে, খোদার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে'।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সা.) যখন বাইরে আসেন তখন যুবকদের অনুশোচনা হয়। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার পরামর্শই সঠিক। মদীনার (অভ্যন্তরে) থেকেই আমাদের শত্রুর মোকাবিলা করা উচিত। তিনি (সা.) বলেন, 'খোদার নবী বর্ম পরিধান করার পর তা আর খুলেন না। এখন যা-ই হোক না কেন আমরা সম্মুখেই অগ্রসর হব। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে তোমরা খোদার সাহায্য লাভ করবে'।

যাহোক, ইসলামী সেনাদলের যাত্রার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। মহানবী (সা.) এক হাজার সৈন্য সাথে নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। মহানবী (সা.) তখন তিনটি বর্শা বা বল্লম আনান এবং এর ওপর তিনটি পতাকা বাঁধেন। অওস গোত্রের পতাকা দেন উসায়েদ বিন হুযায়েরের হাতে, খাযরাজ গোত্রের পতাকা তুলে দেন হুব্বাব বিন মুনযেরের হাতে, কিন্তু কেউ কেউ বলেন, সা'দ বিন উবাদাকে দিয়েছেন। মুহাজিরদের পতাকা দেন হযরত আলী (রা.)'র হাতে। আর মদীনায় যারা রয়ে গেছেন তাদের নামায পড়ানোর জন্য ইবনে উম্মে মাকতুমকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। এরপর মহানবী (সা.) নিজের ঘোড়া 'সাকেব'

এর ওপরে আরোহণ করেন, ধনুক গলায় ঝোলান এবং বর্শা হাতে তুলে নেন। রেওয়ায়েতে অনুসারে, উহুদের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের কাছে দুটি ঘোড়া ছিল; একটি ঘোড়া ছিল মহানবী (সা.)-এর কাছে যেটির নাম ছিল 'সাকেব'। আর দ্বিতীয় ঘোড়াটি ছিল হযরত আবু বুরদা (রা.)'র কাছে যেটির নাম ছিল 'মুলাবে'। আর মুসলমানরাও অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তাদের মধ্যে একশ'জন ছিলেন বর্ম পরিহিত। আর দুই সা'দ অর্থাৎ সা'দ বিন মু'আয এবং সা'দ বিন উবাদা তাঁর সম্মুখভাবে দৌড়াতে থাকেন; তারা উভয়ে বর্ম পরিহিত ছিলেন, আর বাকি লোকেরা তাঁর ডানে-বামে ছিল। মহানবী (সা.) সানিয়্যা নামক স্থানে পৌঁছার পর এক বিশাল সশস্ত্র সৈন্যদল দেখেন। তাদের অস্ত্রশস্ত্রের ঝংকার শোনা যাচ্ছিল। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, এরা কারা? সাহাবীরা উত্তর দেন, এরা ইহুদীদের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের মিত্র। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, ইহুদীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে কি? উত্তরে বলা হয়, না। তখন তিনি বলেন, আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য নেব না।

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-ও লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাদলের জন্য তিনটি পতাকা প্রস্তুত করান। অওস গোত্রের পতাকা উসায়েদ বিন হুযায়েরের হাতে তুলে দেন, খাযরাজ গোত্রের পতাকা হুব্বাব বিন মুনযেরের হাতে এবং মুহাজিরদের পতাকা হযরত আলী (রা.)-কে প্রদান করা হয়, পরবর্তীতে এই পতাকা হযরত মুসআব বিন উমায়েরকে দেয়া হয়েছিল। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুমকে মদীনায় ইমামুস্ সালাত নিযুক্ত করে তিনি (সা.) সাহাবীদের একটি বড় দল নিয়ে আসরের নামাযের পর মদীনা থেকে যাত্রা করেন। অওস ও খাযরাজ গোত্রের নেতৃদ্বয়, সা'দ বিন মু'আয এবং সা'দ বিন উবাদা তাঁর বাহনের সামনে ধীরগতিতে দৌড়াচ্ছিলেন আর অন্যান্য সাহাবীরা তাঁর ডানে, বামে ও পেছনে হাঁটছিল।

মহানবী (সা.) রওয়ানা হয়ে শায়খাঈন নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। এটি ছিল মদীনার দুটি পাহাড়। এখানে পৌঁছে তিনি (সা.) তাঁর সৈন্যদলকে পরিদর্শন করেন এবং সেসব কিশোরকে ফেরত পাঠিয়ে দেন যাদের সম্পর্কে তিনি ধারণা করেছিলেন যে, এদের বয়স এখনও ১৫ বছর হয় নি অথবা যারা ১৪ বছর বয়সের ছিল। ইমাম শাফী লিখেছেন যে, তিনি ১৪ বছর বয়স্ক সেই ১৭জন বালককে ফেরত পাঠিয়ে দেন যাদেরকে তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল। আর যখন তাঁর সামনে ১৫ বছরের ছেলেদের উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেন। স্বল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে যাদেরকে ফেরত পাঠানো হয় আর যারা তেজোদীপ্ত বালক ছিল তাদের কতকের নামও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে দেখা যায়। তারা হলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, যায়েদ বিন সাবেত, উসামা বিন যায়েদ, যায়েদ বিন আরকাম, বারা' বিন আযেব, উসায়েদ বিন যুহায়ের, আরাবা বিন অওস, আবু সাঈদ খুদরী, অওস বিন সাবেত, সা'দ বিন বহীর, ইবনে মুআবিয়া বাজলী, সাঈদ বিন হাবতা (হাবতা তার মায়ের নাম ছিল), সা'দ বিন উকায়েব, যায়েদ বিন জারিয়া, জাবের বিন আব্দুল্লাহ্। (এই জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ তিনি নন যার বরাতে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ইনি অন্য একজন,) রাফে' বিন খাদীজ এবং সামরা বিন জুনদুব।

রাফে' বিন খাদীজ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে বলা হয় যে, সে তিরন্দাজ। তখন তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন। {প্রথমে তাকে বলা হয়েছিল, ফেরত যাও, কিন্তু যখন জানা গেল, সে দক্ষ তিরন্দাজ তখন তিনি (সা.) তাকে অনুমতি দেন।} তখন সামরা বিন জুনদুব বলেন, মহানবী (সা.) রাফে' বিন খাদীজকে অনুমতি দিয়েছেন আর আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, অথচ আমি মল্লযুদ্ধে তাকে ধরাশায়ী করতে পারি। মহানবী (সা.) এ বিষয়টি

অবগত হলে বলেন, তোমরা উভয়ে মল্লযুদ্ধ করো। মল্লযুদ্ধে সামরা রাফে'কে ধরাশায়ী করেন। তখন তিনি (সা.) তাকেও অনুমতি প্রদান করেন।

এরপর রেওয়ায়েতে আরো উল্লেখ আছে, মহানবী (সা.) যখন সেনাদল পরিদর্শন করা শেষ করেন এবং সূর্য ডুবে গেল তখন হযরত বেলাল (রা.) মাগরিবের আযান দেন এবং মহানবী (সা.) নামায পড়ান। অতঃপর এশার আযান দেন এবং তিনি (সা.) এশার নামায পড়ান এবং শায়খাঈন নামক স্থানে এই রাত অতিবাহিত করেন। আর এই রাতে পাহারা দেয়ার জন্য মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে নিগরান বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি পঞ্চাশজন সাথে নিয়ে সেনাদলের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। তিনি (সা.) বলেন, আজ রাত আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে কে থাকবে? অর্থাৎ গোটা সৈন্যবাহিনীর এবং মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার দায়িত্ব কে পালন করবে? তখন যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস (রা.) দাঁড়ালেন, বর্ম পরিধান করলেন, নিজের চামড়ার ঢাল হাতে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে পাহারা দিতে লাগলেন; এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর থেকে পৃথক হন নি। রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেহরীর সময় পর্যন্ত বিশ্রাম নিলেন। রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে, প্রভাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি ফিরিশতারা হযরত হামযাকে (রা.) গোসল দিচ্ছে। এই ব্যাপারে 'সীরাত খাতামান্ নবীঈন' গ্রন্থে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন,

"উহুদ পাহাড় মদীনার উত্তরে প্রায় তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এর অর্ধেক দূরত্বে পৌঁছে শায়খাঈন নামক স্থানে তিনি (সা.) যাত্রাবিরতি দিলেন এবং ইসলামী সেনাদল সম্পর্কে একটি জরিপ করার আদেশ দিলেন। অল্পবয়স্ক কিশোররা যারা জিহাদের আগ্রহে সাথে এসেছিল তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, উসামা বিন যায়েদ, আবু সাঈদ খুদরী (রাযিআল্লাহু তা'লা আনহুম) প্রমুখ সবাইকে ফেরত পাঠানো হয়। রাফে' বিন খাদীজ (রা.) এসব কিশোরদের সমবয়সী ছিলেন, কিন্তু তির নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন। তার এই দক্ষতার কারণে তার পিতা মহানবী (সা.) এর সকাশে তার পক্ষে সুপারিশ করলেন যেন তাকে জিহাদে যোগদান করার অনুমতি দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) যখন রাফে'র দিকে চোখ তুলে তাকালেন তখন তিনি সৈনিকদের মতো সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন যেন তাকে লম্বা ও সবল মনে হয়। তার এই কৌশল কাজে আসলো, মহানবী (সা.) তাকে সাথে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। এতে আরেক কিশোর সামরা বিন জুনদুব (রা.), যেভাবে এখনই বর্ণনা করা হলো– তাকে ফেরত যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে নিজের পিতার কাছে গিয়ে বলে, যদি রাফে'কে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আমাকেও অনুমতি দেওয়া উচিত। কেননা আমি রাফে'র চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং তাকে কুস্তিতে ধরাশায়ী করে ফেলি। পুত্রের নিষ্ঠায় পিতা যারপরনাই আনন্দিত হলেন এবং তাকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিজের পুত্রের বাসনা ব্যক্ত করলেন। মহানবী (সা.) হেসে বললেন, ঠিক আছে রাফে' এবং সামরা'র কুস্তি করাও যেন কে বেশি শক্তিশালী সেটা জানা যায়। কুস্তি হলো এবং বাস্তবেই সামরা চোখের পলকে রাফে'কে কুপোকাত করলেন। এতে মহানবী (সা.) সামরা'কেও সাথে যাওয়ার অনুমতি দিলেন আর এই নিষ্পাপ কিশোরের হৃদয় আনন্দে ভরে গেল। এখন যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল এজন্য বেলাল (রা.) আযান দিলেন এবং সব সাহাবী মহানবী (সা.)-এর ইমামতিতে নামায পড়লেন। রাতের জন্য মুসলমানরা এখানেই শিবির স্থাপন করলো। মহানবী (সা.) রাতের পাহারার জন্য মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে (রা.) দায়িত্ব অর্পণ করলেন, তিনি পঞ্চাশজন সাহাবীর একটি দলকে নিয়ে সারারাত ইসলামী সেনাদলের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে পাহারা দিলেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল প্রথমে সাথে এসেছিল, কিন্তু পথিমধ্যে ফেরত চলে গিয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, সেহরীর সময় মহানবী (সা.) শায়খাঈন নামক স্থান থেকে যাত্রা করলেন এবং মদীনা ও উহুদ পাহাড়ের মধ্যবর্তী শওত নামক স্থানে পৌঁছে নামাযের সময় হয়ে গেল এবং এই স্থানে তিনি (সা.) ফজরের নামায আদায় করলেন। শওত, কিনাহ্ উপত্যকা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান। এই স্থানেই আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল নিজের মুনাফিক সঙ্গীদের সাথে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করে ফেরত চলে যায়। তার সঙ্গীদের সংখ্যা ছিল তিনশ যারা সবাই মুনাফিক ছিল। ফেরত আসার সময় আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বলতে লাগলো, তিনি অর্থাৎ মহানবী (সা.) আমার কথা মানেন নি, বরং কমবয়স্ক বালকদের কথা মেনেছেন। ছেলে-ছোকরাদের কথা মেনে নেন যাদের মতামত কোনো মূল্যই রাখে না। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বললো, আমরা জানি না কিসের ভিত্তিতে আমরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেবো। এজন্য হে লোকসকল! চল আমরা ফিরে যাই। মুনাফেকদের নেতার এই নির্দেশে তার মুনাফেক সাথিরা মুসলমানদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে ফেরত চলে যায়। তাদেরকে যেতে দেখে হযরত জাবের (রা.)'র পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) যিনি আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর মতোই খাযরাজ গোত্রের একজন বড় নেতা ছিলেন, তিনি সেই পলায়নরত মুনাফেকদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এটি কি তোমাদের জন্য সমীচীন যে, তোমরা ঠিক এই মুহূর্তে নিজ নবী ও নিজ জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছ, যখন কিনা শত্রুরা নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়ে তাদের মোকাবিলায় দণ্ডায়মান? এই কথা শুনে তারা বললো, আমরা যদি জানতাম যে, তোমরা যুদ্ধ করার জন্য এসেছ তাহলে তো আমরা তোমাদের সাথেই আসতাম না। আমরা তো ভেবেছিলাম কোনো রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না। এভাবে তারা স্পষ্টভাবে যুদ্ধ থেকে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দিল। অথচ তারা অনেক প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধের জন্য এসেছিল। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) বললেন 'হে আল্লাহ্র শত্রুরা! আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করুন, অচিরেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীকে তোমাদের অমুখাপেক্ষী করে দিবেন।'

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে আল্লামা ইবনে জওযী লিখেছেন, 'যখন বনু সালামা ও বনু হারেসা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখলো তখন তারাও ফিরে যেতে মনস্থ করে। এই দুটি গোত্র সেনাবাহিনীর দুটি বাহুতে (অর্থাৎ দুই উইং) ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা গোত্র দুটিকে এই পাপ থেকে রক্ষা করলেন আর তারা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলো। আল্লাহ্ তা'লা এই প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযিল করেন-

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (আলে ইমরান : ১২৩)

অর্থাৎ 'যখন তোমাদের মধ্য থেকে দুটি দল ভীরুতা প্রদর্শন করার মনস্থ করলো অথচ আল্লাহ্ তা'লা তাদের উভয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন; আল্লাহ্ তা'লার উপরেই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত'।

আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এবং তার তিনশত সঙ্গীর এই বিশ্বাসঘাতকতার পর রসূল করীম (সা.)-এর সাথে শুধুমাত্র সাতশত লোক অবশিষ্ট রইলো। এদিকে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই যখন ফিরে গেল তখন আনসারগণ রসূল করীম (সা.)-কে বললেন 'হে আল্লাহ্র রসূল! ইহুদীদের মধ্যে যে–সকল লোক আমাদের সাথে মিত্র ও আমাদের সমর্থক– আমরা কি এই মুহূর্তে তাদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারি না?' এর দ্বারা তারা মদীনার ইহুদীদের বুঝিয়েছেন আর তাদের মধ্যে হয়তো বনু কুরায়যার ইহুদীদের কথা বলছিলেন। কেননা বনু কুরায়যার

ইহুদীরা হযরত সা'দ বিন মুআ'য (রা.)'র মিত্র ছিল। আর হযরত সা'দ বিন মুআ'য (রা.) অওস গোত্রের নেতা ছিলেন। হযরত সা'দ সম্পর্কে অনেক আলেম এই মন্তব্য করেছেন, আনসারদের মধ্যে তার অবস্থান ও পদমর্যাদা তেমনই ছিল যেমন মুহাজেরগণের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)'র মর্যাদা ছিল। যাহোক আনসারদের এই প্রশ্নের উত্তরে রসূল করীম (সা.) কেবল এতটুকুই বললেন, 'আমাদের তাদের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই'। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন–

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ তিন হিজরী সনের পনেরো শাওয়াল তথা ৩১ শে মার্চ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ শনিবার সেহ্‌রীর সময় ইসলামী সেনাবাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হতে শুরু করে এবং পথিমধ্যে নামায আদায় করে ভোর হতেই উহুদের পাদদেশে পৌঁছে যায়। এই সময়ে বক্র প্রকৃতির লোক মুনাফেকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল বিশ্বাসঘাতকতা করে আর নিজের তিনশত সঙ্গী নিয়ে মুসলমান সেনাবাহিনী থেকে পৃথক হয়ে এই কথা বলে মদীনার উদ্দেশ্যে ফেরত রওয়ানা হয়, 'মুহাম্মদ (সা.) আমার কথা মানেন নি আর অনভিজ্ঞ যুবকদের কথায় (যুদ্ধ করতে) বাহিরে এসেছেন, তাই আমি তাঁর সাথে মিলে যুদ্ধ করতে পারব না।'

কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবেও তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছে যে, এই বিশ্বাসঘাতকতা ঠিক নয়। কিন্তু সে কারো কথা বলতে থাকে যে, এটি যদি কোনো যুদ্ধ হতো তাহলে আমি তাতে অংশ নিতাম। কিন্তু এটি কোনো যুদ্ধই না বরং নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। এর ফলে ইসলামী সৈন্যবাহিনীতে কেবল সাতশ সদস্য রয়ে যায় যা কাফেরদের তিন হাজার সৈন্যের বিপরীতে এক–চতুর্থাংশেরও কম ছিল, আর বাহন ও যুদ্ধসামগ্রীর দিক থেকেও ইসলামী সৈন্যবাহিনী কুরাইশ বাহিনীর তুলনায় নিতান্ত দুর্বল ও তুচ্ছ ছিল, কেননা মুসলমান বাহিনীতে কেবল একশ বর্মধারী ও মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। এর বিপরীতে কাফেরদের সৈন্যবাহিনীতে সাতশ বর্মধারী, দুইশ ঘোড়া এবং তিন হাজার উট ছিল। এই দুর্বলতার মাঝে যা মুসলমানরা ভালোভাবে অনুভব করছিল– আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর তিনশ মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা কতক দুর্বলচিত্ত মুসলমানের হৃদয়ে এক অস্থিরতা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এবং তাদের মাঝে কেউ কেউ দোদুল্যমান হতে থাকে। যেমন কুরআন মজীদেও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, এই অস্থিরতা ও উদ্বেগের মধ্যে মুসলমানদের দুটি গোত্র বনু হারেসা ও বনু সালামা মদীনায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, কিন্তু হৃদয়ে যেহেতু ঈমানের জ্যোতি বিদ্যমান ছিল তাই পুনরায় সামলে ওঠে এবং বাহ্যিক উপকরণের দিক থেকে মৃত্যুকে সামনে দেখেও স্বীয় মনিবের সাহচর্য পরিত্যাগ করে নি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি (সা.) এক হাজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন এবং কিছুদূর গিয়েই রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্যে তাঁবু গাড়েন। তাঁর (সা.) স্থায়ী রীতি ছিল, তিনি শত্রুর নিকট পৌঁছে নিজের সৈন্যবাহিনীকে কিছুটা বিশ্রাম নেবার সুযোগ দিতেন যেন তারা নিজেদের সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে নিতে পারে। ফজরের নামাযের সময় যখন তিনি (সা.) বের হন তখন তিনি বুঝতে পারেন, কতক ইহুদী তাদের সন্ধিভুক্ত গোত্রসমূহকে সাহায্য করার অজুহাতে এসেছে। তিনি (সা.) যেহেতু ইহুদীদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে জানতেন তাই তিনি (সা.) বলেন, এদেরকে ফেরত পাঠানো হোক। এতে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল যে কিনা মুনাফিকদের নেতা ছিল– এই বলে নিজের সাথে তিনশ সঙ্গীসাথি নিয়ে ফেরত গেল যে, এখন আর এটি যুদ্ধ নয়; এটি তো ধ্বংসের মুখে যাবার নামান্তর। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের ফেরত যাবার এটি আরেকটি কারণ ছিল অর্থাৎ সে বলেছিল, এই ইহুদীদের কেন অন্তর্ভুক্ত করা হবে না? এটি তো ধ্বংসের মুখে নিপতিত হবার

নামান্তর, কেননা নিজেরাই নিজেদের সাহায্যকারীদের যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা হচ্ছে। ফলাফলস্বরূপ, মুসলমানরা কেবল সাতশ রয়ে গেল যা কিনা কাফেরদের সংখ্যার এক–চতুর্থাংশেরও কম ছিল আর যুদ্ধসামগ্রীর দিক থেকে আরো দুর্বল, কেননা কাফেরদের মাঝে সাতশ বর্মধারী ছিল, পক্ষান্তরে মুসলমানদের ছিল একশ বর্মধারী; আবার কাফেরদের মাঝে দুইশ অশ্বারোহী ছিল কিন্তু মুসলমানদের নিকট মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল।

মহানবী (সা.) যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনু হারেসা উপত্যকায় পৌঁছান তখন এক সাহাবীর ঘোড়া লেজ নাড়ালে তা তাঁর তরবারিতে গিয়ে লাগে। এতে তিনি বিপদের আশঙ্কা করে নিজের তরবারি হাতে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইতিবাচক কথাবার্তা পছন্দ করতেন আর অলুক্ষুণে কথাবার্তা অপছন্দ করতেন। যার তরবারি ছিল তাকে তিনি বলেন যে, তরবারি খাপে ঢুকিয়ে রাখো, কেননা আমার মনে হয় আজকে তরবারি ধারণ করা হবে। এর অর্থ এটিই মনে হয়। অতঃপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, কে আছে যে আমাদের নিকটবর্তী পথ ধরে শত্রু পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে? অর্থাৎ এমন পথ যা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। এতে হযরত আবু খায়সামা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি নিয়ে যাব। ইবনে সা'দ প্রমুখ তার নাম আবু হাসমা বলেছেন। যাহোক, তিনি তাঁকে (সা.) বনু হারেসার বসতিস্থল, জমি ও সম্পত্তির ওপর দিয়ে মুসলমানদের সাথে করে নিয়ে যান, এমনকি উহুদ প্রান্তরে তিনি পৌঁছে তাঁবু গাড়েন।

তিনি (সা.) এমনভাবে শিবির স্থাপন করেন যে, উহুদ পাহাড়কে নিজের পিছনে ও মদীনাকে সম্মুখে রাখেন। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। মুসলমানরা উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় আর শনিবার ফজরের নামাযের সময় ঘনিয়ে আসলে মুসলমানরা মুশরিকদের দেখতে পায়। হযরত বেলাল (রা.) আযান ও ইকামত প্রদান করেন আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের ফজরের নামায পড়ান। মুহাম্মদ বিন উমর আসলামী বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) দাঁড়ান ও জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করে বলেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের সে বিষয়ে ওসিয়্যত করছি যা আল্লাহ্ তা'লা নিজ গ্রন্থে আমাকে ওসিয়্যত করেছেন, অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করার এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়াদি এড়িয়ে চলার। আজ তোমরা প্রতিদান ও পুণ্য অর্জনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছ। যে ব্যক্তি তা স্মরণ রেখেছে সে নিজেকে এ উদ্দেশ্যে ধৈর্য্য, বিশ্বাস ও আন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে প্রস্তুত রেখেছে। [আজকে তোমরা যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছ তার জন্য তোমাদের ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে।] কেননা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা অসাধারণ কষ্টের কাজ। খুব অল্পসংখ্যক লোকই এতে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে, তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা হেদায়েত দান করেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আনুগত্যকারীদেরই সাথে থাকেন আর শয়তান আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যদের সাথে থাকে। সুতরাং তোমরা জিহাদের ওপর ধৈর্য্য ধারণ করে নিজেদের কর্মের সূচনা করো এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি সন্ধান করো। আর আমি তোমাদের যে কাজের নির্দেশ প্রদান করি তা তোমাদের জন্য করা আবশ্যক, কেননা আমি মরিয়া হয়ে চাই যে, তোমরা হেদায়াত পাও। নিঃসন্দেহে মতবিরোধ ও ঝগড়া, পরাজয় এবং দুর্বলতার লক্ষণ। আল্লাহ্ তা'লা এগুলো অপছন্দ করেন। কোনো মতবিরোধ থাকা সমীচীন নয় আর (যে এরূপ করে) তাকে তিনি সাহায্য ও সফলতা প্রদান করেন না। হে লোকসকল! এটি আমার হৃদয়ে প্রোথিত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হারামে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্ তা'লা তার ও নিজের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন। যে হারাম কাজ করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অপছন্দ করেন আর যে আল্লাহ্‌র খাতিরে সে হারাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে,

আল্লাহ্ তা'লা তার পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে আমার প্রতি একবার দরূদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতারা তার জন্য দশবার রহমত প্রেরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান কিংবা কাফেরের সাথে সদাচরণ করবে, তার প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার কাছে রয়েছে। সে পৃথিবীতে তা পাবে দ্রুত আর আখিরাতেও পাবে, তবে কিছুটা বিলম্বে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনয়ন করে তার জন্য জুমুআ আবশ্যক, তবে তাদের কথা ভিন্ন যারা শিশু, মহিলা, অসুস্থ অথবা অধীনস্ত দাস। আর যে তাঁর থেকে উদাসীন হবে আল্লাহ্ তা'লাও তার পরোয়া করবেন না। অর্থাৎ মুসলমানদের কীরূপে থাকা উচিত তিনি (সা.) সে সম্পর্কে পুরো নসীহত প্রদান করেছেন। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন সে স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি (সা.) এমনটি করা সমীচীন মনে করলেন। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, আর আল্লাহ্ তা'লা প্রাচুর্যের অধিকারী ও প্রশংসিত। আমার জানামতে যেসব আমল বা কর্ম তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী করবে আমি তোমাদেরকে সেগুলোর আদেশ দিয়ে দিয়েছি। আমার জানামতে যেসব কর্ম তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটতর করতে পারে আমি তোমাদেরকে তা থেকে বারণ করেছি। আর রুহুল আমীন [জিবরাঈল (আ.)] আমার হৃদয়ে এ ইলহাম অবতীর্ণ করেছেন যে, কোনো প্রাণ তার সম্পূর্ণ রিযিক হস্তগত করার পূর্বে মৃত্যু বরণ করবে না। তার রিযিকে কোনো ঘাটতি হবে না, সে রিযিক বিলম্বেই লাভ হোক না কেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা কর্মের প্রতিদান দেন। [এখানে 'রিযিক' বলতে সর্বপ্রকার রিযিককে বুঝাচ্ছে।] সুতরাং তোমরা নিজ সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করো ও রিযিকের সন্ধানে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। আর বিলম্বে রিযিক লাভ হওয়া তোমাদেরকে যেন এদিকে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা তা (রিযিক) আল্লাহ্র অবাধ্যতার মাঝে অনুসন্ধান করবে। সৎকর্ম, সর্বোত্তম চরিত্র, পবিত্র রিযিকের অনুসন্ধানে রত থাক কেননা আল্লাহ্র ভাণ্ডারে যা আছে বান্দা কেবল তাঁর আনুগত্যের দ্বারাই তা লাভ করতে পারবে। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য হালাল ও হারামকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন, কিন্তু এ দুটির মাঝে অনেক সন্দেহপূর্ণ বিষয়াদি রয়েছে যা সম্পর্কে অনেক লোকই অনবগত; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যাকে সুরক্ষিত রেখেছেন সে-ই তা জানে। সুতরাং যে তা পরিত্যাগ করবে সে নিজ সম্মান ও ধর্মের সুরক্ষা বিধান করবে, আর যে এগুলোতে লিপ্ত হবে অর্থাৎ মন্দ বিষয়ে জড়িয়ে যাবে তার অবস্থা সেই রাখালের ন্যায় হবে যে নিষিদ্ধ চারণভূমির নিকটে পশু চরায়। সে উক্ত চারণভূমিতে প্রবেশ করার দ্বারপ্রান্তে। আর প্রত্যেক রাজার একটি নিষিদ্ধ চারণভূমি থাকে। শুনে রাখ! মহান আল্লাহ্ তা'লারও নিষিদ্ধ চারণভূমি হলো তাঁর হারামকৃত জিনিস। অতএব (সুস্পষ্টভাবে যা নিষিদ্ধ) তা থেকে বিরত থাকো। আর মু'মিন সকল মু'মিনের মাঝে এমন যেমনটি দেহের সাথে মাথা থাকে। মাথায় ব্যথা হলে সারা দেহ এর ফলে ব্যথা অনুভব করে।

এ বিষয়গুলো যদি বর্তমানে মুসলমানরা স্মরণ রাখে তাহলে কোনো শত্রুর তাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহসও হবে না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন শত্রু মক্কা থেকে যাত্রা করে মদীনায় পৌঁছায়। যুদ্ধের সেসব সরঞ্জাম যা আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে নিয়ে এসেছিল আর যেটিকে (অর্থাৎ বাণিজ্যিক কাফেলাকে) বাধাগ্রস্ত করতে এবং (যেটির) মদীনা প্রবেশ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-কে বদর পর্যন্ত সফর করতে হয়েছিল আর যাতে কুফরির মহিমা ও দম্ভ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সেই একই সাজসরঞ্জাম মুসলমানদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে একত্রিত করা হয়েছিল। পবিত্র কুরআন নিম্নোক্ত আয়াতে উক্ত সাজসরঞ্জাম এবং তা ব্যয়কারীদের দিকে ইঙ্গিত করছে:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً

(সূরা আনফাল: ৩৭)

এই যুদ্ধে কুরাইশের সাথে বনী তেহামা গোত্র এবং বনী কিনানা গোত্রও শামিল হয়। কাফের সেনাদের সংখ্যা তিন হাজারে গিয়ে উপনীত হয় আর তারা সবাই বর্ম পরিহিত ছিল এবং তাদের অশ্বারোহী ছিল সাতশ জন আর সবাই অতিশয় দ্রুতই মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে উদগ্রীব ছিল। এই ছোট ছোট গোত্রসমূহের সমন্বয়ে গঠিত এ বিশাল সেনাদল আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদীনার উত্তর-পশ্চিমে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিজেদের ঘাঁটি স্থাপন করে। তাদের ও মদীনা শহরের মাঝে কেবল উহুদ পাহাড়ের উপত্যকাটি ছিল। এই স্থানে প্রতিরক্ষা ব্যুহ স্থাপন করে কাফেররা মদীনাবাসীর ক্ষেত-খামার এবং বাগানসমূহ ধ্বংস করা শুরু করে। এর ফলে সাহাবীগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং ইসলামের জন্য আত্মাভিমান প্রতিশোধ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে জোর দিয়ে প্রতিরোধ গড়ার অনুরোধ করেন। মহানবী (সা.) এক হাজার লোক সাথে নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হন। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই নামক এক সর্দার যে মদীনায় বসবাস করতো এবং বাহ্যত মুসলমানদের সাথী ছিল– একান্ত যুদ্ধের সময় এবং এই সংকটময় মুহূর্তে নিজ তিনশত সঙ্গীসাথি নিয়ে মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে যায়, যার ফলে মুসলমানদের সর্বমোট সংখ্যা এক হাজার থেকে কমে সাতশ দাঁড়ায়। এই স্বল্পসংখ্যক লোকের মাঝে কেবল দুটি ঘোড়া ছিল। কিন্তু মুজাহিদরা সাহসিকতার সাথে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে আর খেজুর বাগান অতিক্রম করে উহুদ পাহাড়ে গিয়ে উপনীত হয়। মুসলিম বাহিনী সারাটা রাত এই পাহাড়ের উপত্যকায় কাটিয়ে দেয়। ফজরের নামায আদায় করে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ এসময় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

ফিলিস্তিনীদের জন্য দোয়া করার বিষয়ে আমি ধারাবাহিকভাবে বলছি। দোয়া করতে থাকুন। সম্প্রতি যুদ্ধবিরতি শেষ হবার পর যা ধারণা করা হয়েছিল, ঠিক তা-ই হচ্ছে। ইসরাঈল সরকার পূর্বের তুলনায় ভয়াবহভাবে গাজার প্রত্যেকটি অঞ্চলে বোমাবর্ষণ এবং আক্রমণ করে চলেছে। নিষ্পাপ শিশু এবং নিরপরাধ নাগরিক শহীদ হচ্ছে। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আমেরিকার কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধিও, যিনি সম্ভবত ইহুদী, তিনি বলেছেন, অনেক হয়েছে! এই যুদ্ধ বন্ধে আমেরিকার নিজ ভূমিকা পালন করা উচিত। আমেরিকার প্রেসিডেন্টও চাপাকণ্ঠে বলছেন, গুলিবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ বন্ধ হওয়া উচিত যা উত্তর-দক্ষিণে সমান তালে চলছে। এতদিন বলছিল যে, উত্তর দিকে চলে যাও, সেখানে কিছু হবে না। এখন সেখানেও একই অবস্থা। যাহোক, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্য কোনো মানবতার প্রতি সহানুভূতি দেখানোর উদ্দেশ্যে নয়। এমনটি ভাবা আমাদের জন্য ভুল হবে। বরং এটি তাদের নিজেদের স্বার্থে বলছে, কেননা আমেরিকার নির্বাচন আসন্ন আর সেখানকার যুবকরা এই প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে যে, এই যুদ্ধের যেন ইতি টানা হয়। একইভাবে আমেরিকার মুসলিম যুবকরাও হৈচৈ করছে। যাহোক, এরা নিজেদের ভোট লাভের আশায় এগুলো করছে। ফিলিস্তিনীদের বা মুসলমানদের প্রতি তাদের কোনোরূপ সহানুভূতি নেই।

বাকি থাকল মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহ। তাদের আওয়াজে কিছুটা শক্তি দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সবাই এক হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা না করবে ততদিন কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের মাঝেও ঐক্য সৃষ্টি করে দিন। অমুসলিম বিশ্ব

জানে যে, মুসলমানদের মাঝে একতা নেই, বরং একদল মুসলমান আরেকদল মুসলমানকে হত্যা করার চেষ্টায় রত। ইয়েমেনে কী না হচ্ছে! এমনিভাবে অন্যান্য (মুসলিম অধ্যুষিত) দেশ রয়েছে। মুসলমানদের হাতে হাজার হাজার শিশু ও নিষ্পাপ লোক মারা যাচ্ছে, বরং বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ লক্ষ (মানুষ মারা যাচ্ছে)। এই বিষয়ই অমুসলিমদেরকে সাহস যোগাচ্ছে; অর্থাৎ মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করলে কোনো সমস্যা নেই, কেননা এরা তো নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করে। যেক্ষেত্রে মুসলমানরাই মুসলমানদের প্রাণ নিয়ে চিন্তিত নয় তাহলে শত্রু কেন অযথা চিন্তা করবে: আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে অতি ভয়ানক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। অর্থাৎ কোনো মুসলমান যদি অন্য কোনো মুসলমানকে হত্যা করে তবে ঘাতক জাহান্নামী হবে। আল্লাহ্ করুন, মুসলমানরা যেন এক হয়ে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ করার পরিবর্তে জগৎ থেকে অত্যাচার বিলুপ্ত করার মাধ্যম হয়।

জাতিসংঘও নিজেদের আওয়াজ কিছুটা উচ্চকিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের কথা কে শোনে! তারা বলে যে, 'আমরা এই করব! সেই করব!' কিন্তু তাদের করার কিছুই নেই। তাদের কথা কেউ শোনেও না। বড় বড় পরাশক্তিগুলো নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের প্রতি দয়া করুন। যাহোক, এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য আমাদের দোয়ার পাশাপাশি, পূর্বেও আমি জামা'তের মাধ্যমে বাণী পাঠিয়েছিলাম যে, আপনাদের স্থানীয় কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদদের এই অত্যাচারের অবসানের জন্য আওয়াজ তুলতে নিয়মিত মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত। এমনিভাবে নিজ গণ্ডিতে পরিচিতদের মাঝে এ কথা প্রচার করুন যে, এই অত্যাচারের অবসানের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা নিষ্পাপ এ লোকদেরকে এই অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন।

নামাযের পর আমি দুটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা হল্যান্ডের অধিবাসী মুকাররমা মাসুদা বেগম আকমল সাহেবার। তিনি ছিলেন মুরব্বী সিলসিলাহ মরহুম আব্দুল হাকীম সাহেবের সহধর্মিণী। সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করেছেন إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাঁর নানা মিয়া আব্দুস সামাদ সাহেব (রা.) এবং প্রপিতামহ মিয়া ফতেহ দ্বীন সাহেব সেখওয়া (রা.) কাদিয়ানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁরা উভয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। মরহুমা দীর্ঘদিন হল্যান্ডে নিজ স্বামীর সাথে ধর্মসেবায় নিমগ্ন ছিলেন। ১৯৫৭ সালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশনায় আকমল সাহেব প্রথমবার হল্যান্ড গিয়েছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর স্ত্রী সাথে ছিলেন না। মরহুমা ১৯৬৯ সালে সেখানে যান। এরপর পুনরায় ফেরত চলে আসেন, আবার ১৯৮৬ সালে হল্যান্ড যান। নিজ স্বামীর বহির্বিশ্বে পোস্টিং থাকায় বৈবাহিক জীবনে তিনি প্রায় ১৫ বছর পৃথক থেকেছেন [অর্থাৎ একাকী জীবন-যাপন করেছেন।]

হল্যান্ড থাকাকালীন সময় সেখানকার 'লাজনা ইমাইল্লাহ্' প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলান্ডের লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রথম সদর হওয়ার গৌরবও লাভ করেন। খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। মুত্তাকি, পরহেযগার এবং নিয়মিত নামায ও রোযায় অভ্যস্ত মহিলা ছিলেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনজন পুত্রসন্তান ও একজন কন্যাসন্তান রয়েছে এবং তারা সকলেই কোনো না কোনোভাবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে জামা'তের সেবা করে যাচ্ছেন। তাঁর এক পুত্র পূর্বে আনসারুল্লাহ্র সদর ছিলেন, এখন অন্যজনও সম্ভবত এ বছর আনসারুল্লাহ্র সদর নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়াও জামা'তের অন্যান্য সেবা প্রদান করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে

ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদের তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ ওয়াকফে যিন্দেগী মাস্টার আব্দুল মজীদ সাহেবের, তিনিও তালীমুল ইসলাম হাইস্কুল, রাবওয়াতে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনিও কিছুদিন পূর্বে অবসর গ্রহণের পর ইদানিং কানাডাতে বসবাস করছিলেন আর সেখানেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিন পুত্র ও দুজন কন্যাসন্তান রয়েছে।

তার ছেলে মাযহার মজীদ সাহেব বলেন, আমার বাবা অনেক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। খুব বিনয়ী এবং দরবেশী জীবন যাপন করেছেন। মা বলেন, বিবাহ থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে ফেরেশতাসুলভ মানুষ পেয়েছি। বিবাহের কয়েক বছর পর একদিন নামাযে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করে দোয়া করছিলেন। নামাযের পর আমি জিজ্ঞেস করি যে, আপনি কোন জিনিসের জন্য দোয়া করছেন। তখন তিনি বলেন যে, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, আমি আমার জীবন উৎসর্গ করে রাবওয়ার তা'লীমুল ইসলাম হাইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে সেবা করি। [পূর্বে নিজ এলাকায় অন্য কোনো কাজে নিয়োজিত ছিলেন।] আমি দোয়া করছি, আল্লাহ্ যেন আমার ইচ্ছা পূর্ণ করেন এবং আমার স্ত্রীকেও এ বিষয়ে সম্মত করে দেন, তার মন প্রশান্ত করে দেন। যাহোক, তখন তার সহধর্মিণী বলেন, আপনি দ্রুত হযরত খলীফাতুল মসীহ্'র সমীপে ওয়াকফে যিন্দেগী করার আবেদনপত্র প্রেরণ করুন। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় তিনি ওয়াকফে যিন্দেগী করার আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। [এটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র যুগের কথা]। তিনি (রা.) আবেদনপত্র মঞ্জুর করেন এবং তিনি (অর্থাৎ মরহুম আব্দুল মজীদ সাহেব) রাবওয়া চলে যান।

তিনি আরো বলেন, আমার পিতা প্রত্যেক মাসে ভাতা পাওয়ার পর প্রথমে সেক্রেটারি মালের কাছে গিয়ে চাঁদা দিতেন, তারপর অবশিষ্ট অর্থ মায়ের হাতে দিতেন। রাবওয়াতে আসার পর অনেক কষ্টে জীবন অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু কখনো কোনো অভিযোগ-অনুযোগ করেন নি। কখনও পার্থিব জিনিসের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন নি। ভাই-বোনদেরকে সবসময় সময়মত নামায আদায় করার, জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ প্রদান করতেন। সেই সময় জামা'তের আর্থিক অবস্থা বর্তমান যুগের মতো (এতটা স্বচ্ছল) ছিল না, অনেক সংকট ছিল। তা সত্ত্বেও অনেক ধৈর্য্যের সাথে জীবন অতিবাহিত করেছেন। আমি যখন সেই স্কুলে পড়তাম তখন তিনি শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন। আমি নিজে দেখেছি, সত্যিই তিনি এসব গুণের অধিকারী ছিলেন। সন্তান পিতার প্রশংসা করেছে তাই আমি বলছি– বিষয়টি এমন নয়। তার মাঝে এই সমস্ত গুণাবলী উপস্থিত ছিল। অ-আহমদীরাও তার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ১৯৮৫ সালে যখন সরকার তাকে প্রমোশন দেয়, পরবর্তীতে ১৯৭৩ বা ১৯৭৪ এর পর স্কুল জাতীয়করণ করা হয়– সেই সময় এই স্কুলে থাকাই পছন্দ করেন। কিছুকাল এই স্কুলে থাকার পর ১৯৮৫ সালে প্রমোশন দিয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে ভেরার ইসলামিয়া হাইস্কুলে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানকার সহকারী প্রধান শিক্ষক যে কিনা জামে মসজিদের ইমামও ছিল, ধারণা করা হচ্ছিল যে, তিনি আহমদী হওয়ার কারণে তার বিরোধিতা করবে; কিন্তু তার উত্তম আদর্শের কারণে তাকে খুব সম্মান করতো, অনেক বেশি সম্মান করতো আর তার প্রতি খুব বিনয়ী ছিল।

বর্ণনাকারী বলছেন, একদিন আমি তাকে অন্য শিক্ষকদের বলতে শুনেছি, ‘এই ব্যক্তি কাদিয়ানী হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতাসুলভ মানুষ’। এভাবে তিনি নীরব তবলীগ করতেন এবং এর মাধ্যমে বিরোধীদের ওপরও প্রভাব সৃষ্টি করতেন। বেশিরভাগ সময় তার ছাত্ররা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতো আর বলতো, আমরা আপনার ছাত্র ছিলাম। কিন্তু তিনি সেই ছাত্রদের নিয়ে সবচেয়ে গৌরব অনুভব করতেন এবং তাদের উল্লেখ করতেন যারা নিজেদের জীবন খোদার পথে উৎসর্গ করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে খুব আনন্দের সাথে বলতেন যে, ওমুক ওয়াকেফে যিন্দেগী একদা আমার ছাত্র ছিল! ওয়াকেফে যিন্দেগীদের অনেক শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন।

আল্লাহ্ তা’লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। তার মর্যাদা উন্নত করুন, তার সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দিন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)